মানিকের কথাসাহিত্যে ময়নাদ্বীপ থেকে ময়নাদল

সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী

'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'হলুদ নদী সবুজ বন' — দুটি উপন্যাস, একই লেখকের। একটি লেখক জীবনের শুরুতে, একটি জীবনের অন্তিম সময়ে লেখা। প্রথমটি বহুপঠিত, বহুচর্চিত, চলচ্চিত্রায়িত এবং বেশ কয়েকবার নানা প্রকরণে নাট্যায়িত, দ্বিতীয় উপন্যাসটি তুলনায় অপরিচিত। অথচ প্রথম উপন্যাসটিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন অসামান্য, ঠিক তারই আরও একটি পরিবর্তিত অসামান্য রূপ দ্বিতীয়টিতেও আছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' লেখকের প্রথম উপন্যাস নয়। 'দিবারাত্রির কাব্য' (যদিও 'জননী'র পরে প্রকাশিত) তাঁর প্রথম উপন্যাস। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' পরে প্রকাশিত) তাঁর তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকাশিত উপন্যাস (১৩৪৩ -এর জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-এ যথাক্রমে প্রকাশিত'।[১] 'দিবারাত্রির কাব্য'তে প্রকাশিত হয়েছে মধ্যবিত্ত মানুষের নৈতিক সংকট, 'জননী' উপন্যাসেও চরিত্রগুলির প্রেক্ষাপট, আর্থ সামাজিক অবস্থা ওই মধ্যবিত্তই, কিন্তু 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় গাওদিয়ার গ্রামীণ সমাজে ডাক্তার শশীর পারিপার্শ্বিকতায় নিম্নবিত্ত মানুষের কথা আছে। তবুও উপন্যাসে চরিত্রগুলি এতটাই প্রকট এতই বিচিত্র বর্নালি তার, তাদের একসঙ্গে দেখতে যাওয়া অর্থাৎ একই সারির অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। অথচ 'পদ্মানদীর মাঝি'তে 'কেতুপুর' -এর সমস্ত ব্যক্তিত্বগুলি দাঁড়িয়ে আছে একটাই সারিতে, আধুনিক কালের ভাষায় তাদের বলা যাবে 'নিম্নবর্গ' যা 'গাওদিয়া' শশীডাক্তারের গ্রামে দেখা মুশকিল।

'পদ্মাপনদীর মাঝি'র প্রকাশকাল ওই ১৯৩৬, যখন কল্লোলোত্তর যুগ। শৈলজানন্দ লিখে ফেলেছেন কয়লাকুঠির কাহিনি নিয়ে উপন্যাস। সাহিত্যচর্চায় এসে গেছেন তারাশঙ্কর, তাঁর বীরভূমের মাটি ও সংস্কৃতির গন্ধ নিয়ে। এসে গেছেন বিভূতিভূষণও।[২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে লেখক - সমালোচকরা 'মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক', 'জটিল ভাবনার লেখক' বলে মন্তব্য করা শুরু করেছেন এই সময়ের পর থেকেই। এর পরবর্তী সময়েরই গবেষকরাও সেই পথ অবলম্বন করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের content কে অত্যন্ত সাধারণভাবে 'জীবনের সাংকেতিকতাও উদ্ভট সমস্যা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[৩] যদিও এই ধারার ভাবনাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের সমালোচনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মুখ্যত মানিকের লেখক জীবনকে তাঁরা কয়েকটি ভাবে বিভক্ত করে ফেলেছেন। তারমধ্যে স্পষ্ট দুটি ভাগ হল ১৯৪৪ -এর আগে ও পরের ভাগ। ১৯৪৪ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এর পরবর্তী কালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের ভাবনাসূত্র, এর পূর্ববর্তী ভাবনাসূত্র থেকে সম্পূর্ণ না - হলেও কিছুটা পৃথক বটে। একজন মানুষের দিকে তাকালে যেমন প্রথমে আমাদের চোখে আসে তার এক একটা বিশেষ বিশেষ অঙ্গ তেমনি যদি ভেবে নেওয়া যায় তবে মানিকবাবু তাঁর প্রথম ফোকাস মনস্তত্ত্বের মধ্যে বহুল প্রক্রিয়ায় ক্ষুধা, অধিকার আর লড়াইকে টেনে এনেছেন। এভাবে ভাগ না করে আমরা যদি সময়ের অভিঘাতেরও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকে লক্ষ রাখি তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্বের ধারায় ধরা পড়া চিন্তাসূত্র ও তার পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে পারা যাবে।

'পদ্মানদীর মাঝি' একটা কাহিনি এবং অবশ্য অবশ্যই নিম্নবর্গের মানুষের কাহিনি। কুবের মাঝি, তার খোঁড়া স্ত্রী মালা, হোসেন মিয়া, রাসু, গোপী, কপিলা, ধনঞ্জয়, গণেশ, প্রীতম মাঝি, যুগি, আমিনুদ্দি, রসুল সকলেই একই সারির মানুষ। হোসেন ধনে মানে বাকিদের থেকে উঁচুতে হলেও সে ডি-ক্লাস্ড্। এদের নিয়ে লেখা উপন্যাসটি Narrative ফর্মেই শুরু হয়েছে এবং এর রীতিগত মুনশিয়ানা ভাষা ব্যবহারের সৌকর্যে Narration এর মধ্যে, ও Content -এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। প্লট নির্মাণে জটিলতার আশ্রয় নিতেই হয় ভালো ঔপন্যাসিককে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উপাখ্যানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এর অনুপুঙ্খতা, তার সঙ্গে জুড়ে গেছে এই উপন্যাসের একটি বহুব্রীহি 'ময়নাদ্বীপ'। এটাই এই উপন্যাসের সব থেকে বড়ো উচ্চতা এবং মাত্রা। আপাত সরলকথনযুক্ত বৃত্তের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের সাংকেতিকতাই হল ওই ময়নাদ্বীপ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সাধারণভাবে সাংকেতিকতা থাকেই। তা শুরুর দিককার উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'র ময়নাদ্বীপ হোক বা 'হলুদ নদী সবুজ বনে'র ময়নাদল। যদিও 'পুতুলনাচ' থেকে 'চিহ্ন', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'প্রতিবিম্ব', 'খুনী' সমস্ত উপন্যাসেই তিনি পাঠককে সংকেত দেন অন্য কোনো ব্যঙ্গ্য'র। এইটি মানিকের একটা বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের সাধারণ ফর্ম Narrative, একথা আগেই বলা হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতে লেখক যেভাবে বাগ্‌বিস্তার করেছেন সেখান থেকেই অবিচ্ছেদ্য Narration -এর আরম্ভ।

বর্ষার মাঝামাঝি।

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চালিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

পাঠক লক্ষ করলে বুঝতে তার অসুবিধা হবে না যে, এই চিত্রে এক একটি বাক্যে এক একটি করে পর্দা উন্মোচিত হচ্ছে। এই ভাবে একটি একটি করে পর্দা উন্মোচনের শেষে নির্মিত হয়েছে প্লট। এই প্লটের মূল আধার একটি চরিত্র, 'কুবের মাঝি'। যার বর্গীয় পরিচয় অনাবশ্যক এবং যে জীবনের খোঁজে পাড়ি দেয় পদ্মায় প্রতিদিন। যদি লড়াইটা শুধু পদ্মানদীর মাঝি কুবেরের নিজের বাঁচার বা নিজ পরিবার - জন- গণ - কৌমকে নিয়ে বাঁচার লড়াইতে থেমে থাকত তাহলে উপন্যাসটির তথাকথিত 'ব্যঙ্গ্য'টিকে খুঁজে পেতাম না আমরা। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি বেশ বড়ো, লেখকের বর্ণনায় হোসেন মিয়ার দ্বীপ, ময়নাদ্বীপ হয়ে ওঠে এখানেই। রাসু ফিরে আসে এই দ্বীপ থেকে পালিয়ে - তার সংসার, পরিবার সমস্ত খুইয়ে। রাসুর বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, ময়নাদ্বীপ জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা। শ্বাপদসংকুলও বটে। সেই দ্বীপের সম্পর্কে অতিরঞ্জন সৃষ্টি করে রাসু। আবার ওই পরিচ্ছেদেই হোসেন মিয়ার আবির্ভাব। কিন্তু ময়নাদ্বীপ সম্পর্কে ধোঁয়াশার সৃষ্টি এই প্লটের একটা বৈশিষ্ট্য। সাধারণ আঙ্গিকে কখন বা Narration

-এর মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে এই পরিচ্ছেদে পরিস্কৃত হয়েছে উপন্যাসের আখ্যান অর্থাৎ বলা যেতে পারে মিখাইল বাখতিল কথিত Dialogism এই উপন্যাসের Narratology -র নির্মাণ করেছে। আর উপন্যাসের এই Narratology -ই প্লটের মধ্যে Polyphony বা বহুস্বরিকতা এনেছে।[৪] চরিত্রগুলির সংলাপে যে ভাষা ব্যবহার হয়েছে তা স্যসুর কথিত সমাজ চিত্রেরই জ্ঞাপক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টাঙ্গাইলের কিশোর জীবনের মাঝিমাল্লাদের সঙ্গ করার অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে তাঁর মনে কাজ করেছে।[৫] Narration এবং সংলাপে নির্মিত এই প্লটে প্রাপ্ত চরিত্রগুলিকে আমরা দেখতে পাই যে ব্যক্তি জীবনের সততার প্রতি এরা তেমন করে দায়বদ্ধ নয়। কারণ দারিদ্র্য। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হিন্দু - মুসলমানের যৌথ বসবাসের সূত্র ধরে মানিক বলেছেন ঃ

> ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই।
>
> সকলেই তার সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে - দারিদ্র্য !

'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসের চরিত্র ঈশ্বরকেও আমরা দেখি সজ্ঞানে রবার্টসন এবং প্রভাত উভয়ের সঙ্গে প্রতারণা করতে। কুবেরও টাকার জন্য গোপীর বিবাহ দেয় না। কিংবা ধনঞ্জয়ের কাছ থেকে মাছ চুরি করে। কিন্তু নৈতিকতাও যে উচ্চবর্গের সৃষ্টি মাত্রায় বাঁধা এদের নীতিভঙ্গের ধরনে সে কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এখানেই মানিকের উপন্যাসগুলি সাধারণভাবে Monologism বা একস্বরিকতা থেকে মুক্ত। উপন্যাসের Narration-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন দর্শকের ভূমিকাই শুধু পালন করেন না। তিনি এমন দর্শক যিনি আখ্যানকে মুক্ত রেখেছেন।

২

ময়নাদ্বীপ, রহস্যময় তার উপস্থিতি। সে যেন তার উপস্থিতিতেই আশ্চর্য চুম্বকের মতো—

> 'কিছু কিছু জঙ্গল সাফ করিয়া এই দ্বীপে হোসেন মিয়া ঋণগ্রস্ত উপবাসখিন্ন পরিবারদের উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। লোভ দেখাইয়া, আশা দিয়া, এক একটি নিরুপায় পরিবারকে সে এই দ্বীপে লইয়া যায়, সৃষ্টির দিন হইতে কখনও আবাদ হয় নাই এমন খানিকটা জমি দেয়, থাকিবার জন্য ঘর দেয়, আবাদের জন্য দেয় হাল বলদ ও জঙ্গল কাটিবার জন্য যন্ত্রপাতি। অন্যান্য স্থান হইতে আরও কতগুলি পরিবারকে সে ওখানে লইয়া গিয়াছে কে জানে, কিন্তু কেতুপুরের জেলেপাড়ার তিনঘর মাঝিকে সে যে আদিম অসভ্য যুগের চাষায় পরিণত করিয়াছে এ খবর জেলেপাড়ায় কারও অজানা নাই। তবু, জানা না জানা তাহাদের পক্ষে সমান। মাথা নিচু করিয়া তাহারা হোসেন মিয়ার দেওয়া উপকার গ্রহণ করিবে। মনুষ্যবাসের অযোগ্য সেই দ্বীপকে জনপদে পরিণত করিবার আহ্বান আসিলে যতদিন পারে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিবে, যেদিন পারিবে না সেদিন স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে হোসেন মিয়ার নৌকায় গিয়া উঠিবে।

এই হল ময়নাদ্বীপ সম্পর্কে লেখকের প্রথম অভিব্যক্তি। কিন্তু হোসেন কী চায় ! একজন ব্যক্তি, সে নানারকমের বেআইনি ব্যবসায় জড়িত, তাকে কখনও উপন্যাসের মধ্যে অহিতকারী কাজে দেখা যাবে না। শুধু তাই নয় গান বাঁধতেও পারে সে। সহজেই ডি-ক্লাসড্ হয়ে কুবের মাঝির ঘরে রাত কাটাতে দেখা যায় তাকে। হোসেন মিয়া নিজের রহস্যময়তায় বুঁদ হয়ে থাকে। ময়নাদ্বীপ থেকে তো সে ভিন্ন আর কেউ যোগসূত্র রক্ষা করে না। তাই ময়নাদ্বীপ আর হোসেন মিয়া সমার্থক হয়ে গেছে। কিন্তু হোসেন মিয়া একটি ব্যক্তিত্ব। তার সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক। কারণ, সে ব্যক্তি এবং একক। ময়নাদ্বীপ তা নয়, ময়নাদ্বীপ এক নরক, হয়তো বা স্বর্গও। অথবা এ-দুয়ের থেকে উচ্চতর নতুন পৃথিবী। রাসুর সংলাপে আমরা ময়নাদ্বীপকে যেভাবে পাই তা হল—

> 'বাঘ-সিঙ্গি ! নামে ডরাইলা ? কী নাই ময়নাদ্বীপে কও ? সাপ যা আছে এক একটা, আস্তা মাইনষেরে গিলা খায় ! রাইতে সমুন্দরের কুমির ডাঙ্গায় উঠ্যা আইসা মাইনষেরে টাইনা নিয়া যায়—'

অথচ ময়না দ্বীপের বিষয়ে মানিক যে কী বোঝাতে চাইছেন তা ক্রমশ পরে প্রকাশিত হয়েছে। আশ্বিনের ঝড়ে আমিনুদ্দির সংসারের সমস্ত উজাড় করে স্ত্রী - পুত্র পরিজনের অকাল মৃত্যুর পর সপ্তম পরিচ্ছেদেই এ কাহিনির শুরু। কুবের আর গণেশ কাজ করতে শুরু করেছে তখন হোসেন মিয়ার কাছে। হোসেন মিয়ার নির্দেশে নৌকার মাল খালাস করে দেবার পরই, আবার যাত্রা অনির্দ্যেশ্যের উদ্দেশ্যে। নৌকায় আছে আমিনুদ্দি আর অচেনা মুসলমান পরিবার। পরিচয়ও জানা লে তাদের, নাম তার রসুল। হোসেন নিয়ার দ্বীপে চলেছে সে সপরিবারে, সঙ্গে ভগ্নী নছিবন। দেখতে দেখতে আমিনুদ্দির সঙ্গে নছিবনের নিকা হয়ে গেল। চলেছে দুটি পরিবার ময়নাদ্বীপের দিকে। কিন্তু কেন ময়নাদ্বীপে—

> আমিনুদ্দি অপরিশোধ্য আর্থিক ঋণেই শুধু আবদ্ধ নয়। হোসেন না দিলে এ জীবনে স্ত্রী কি আর তাহার জুটিত, —নছিবনের মত স্ত্রী ? রসুলকে জেলের দুয়ার হইতে ছিনাইয়া নিয়া আসিয়াছে হোসেন, দেশে ফিরিলে জেলেই হয়তো তাহাকে ঢুকিতে হইবে। প্রতিদানে হোসেন আর কিছুই তাদের কাছে চায় না, তারা শুধু এখানে বসবাস করুক। স্বপ্ন সফল হোক হোসেনের।... নিজেদের জীবিকা তাহারা যতদিন অর্জন করিতে পারিবে না, জীবিকা পর্যন্ত যোগাইবে হোসেন। গৃহ ও নারী, অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও সন্তান সবই তো পাইলে তুমি, এবার শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সন্তানের, এটুকু পারিবে না।

এখানেই শেষ নয়। ময়নাদ্বীপে গিয়ে পৌঁছোবার পরে কাহিনি হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপের দর্শনকে প্রকাশ করল ভালোভাবে। এ কাহিনিতে দর্শক কুবের, কিন্তু এ কাহিনি সূত্রেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে কুবেরের ভবিষ্যৎ। ময়নাদ্বীপে এনায়েত ও বসিরের স্ত্রীর বিষয়ক নিন্দনীয় ঘটনা। এনায়েত ময়নাদ্বীপের সবচেয়ে শক্ত সমর্থ পুরুষ, তার পরিবার রয়েছে, তবু সে কোনো না কোনোভাবে, কিছু - না কিছু উপায়ে বসিরের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করতে যাচ্ছিল যে ঐ দ্বীপেরই আকবরের স্ত্রী এসে পড়ায় বসিরের স্ত্রী রক্ষা পায় বলে প্রকাশ। খবরটা নিন্দনীয় এবং স্থানীয় মোড়ল বিপিন কোনোক্রমে হোসেন

মিয়াকে এটা জানায়। হোসেনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া — 'হারামির পোলারে কাইট্যা দরিয়ায় দিলা না ক্যান?' তারপর শুরু হল এনায়েতের বিচার। শাস্তি দিল হোসেন মিয়া— 'তিন রোজ বাইন্ধা থুমু তোমারে, খানাপিনা মিলব না।' রাতে কুবের দেখল হোসেন মিয়ার ঘরের দাওয়ায় বন্দি এনায়েতকে কেউ একজন ভাত খাওয়াচ্ছে। মেয়েটিকে চেনানোর চেষ্টা লেখক করেননি। কিন্তু কুবের এ প্রসঙ্গে হোসেনকে চুপি চুপি জানানোয় হোসেন মিয়ার সংলাপ এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ—

> —'হোসেন হাই তুলিয়া বলিল, হ? ঘুমাও গা কুবির। আর শোন বাই, কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাইতে মনে মনে থুইও, কইয়া কাম নাই।'

এর পরের অংশটি আরও চমকপ্রদ। কুবের দেখল ফিরে আসার সময় পূর্বোক্ত বসির উঠে এসেছে হোসেনের নৌকায়। হোসেন তাকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। সে বিগত পাঁচ বছর এই দ্বীপে রয়েছে। কিন্তু সন্তান হয়নি। এনায়েতের একটি স্ত্রী আছে, সে কয়েক দিনের মধ্যে সন্তানের জন্ম দেবে। বসির তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। কয়েক মাস বাদে বসিরের স্ত্রীর সঙ্গে নিকা হবে এনায়েতের। এ যেন ওই দ্বীপে মনুষ্যবৃদ্ধি করতে পারায় এনায়েতকে হোসেনের পুরস্কার।

> —'একটি বৌ আছে এনায়েতের, শীঘ্রই সে হোসেনকে উপহার দিবে আনকোরা নতুন মানুষ —ময়নাদ্বীপের একটুকরা ভবিষ্যত। তবুও আরও একটি বৌ হোক এনায়েতের, সার্থক হোক দু'জনের অন্যায় অসামাজিক প্রেম, পাঁচ বছর যে রমণী, জননী হইতে পায় নাই, তার কোল জুড়িয়া আসুক সন্তান, মানুষ বাড়ুক হোসেনের সাম্রাজ্যে।'

এই হল ময়নাদ্বীপ। উপন্যাসে তার উপস্থিতি এতটুকুই। কিন্তু সেখান থেকে কুবেরকে সে আকর্ষণ করে চলেছে। তাই কুবেরের ভাষ্যে উঠে আসে উপন্যাসের শেষে 'হোসেন মিয়া দ্বীপি আমাদের নিবই কপিলা।' কে এই হোসেন মিয়া, যে কিনা ময়নাদ্বীপের কুমারী ধরিত্রীর বুকে বসাতে চলেছে নতুন উপনিবেশ? কুবের তার লক্ষ্য, কুবেরের মতো সরল, শক্তসমর্থ চরিত্রের লোক, যে জেদি, সহজে যে যুদ্ধে হারে না, বিশ্বাসী, এই রকম লোকই তো চাই হোসেন মিয়ার নতুন উপনিবেশের জন্য। হোসেন মিয়ার উপনিবেশবাদ অনন্য। কারণ সে এমন কোনো উপনিবেশ তৈরি করছে না যেখানে শোষণ হচ্ছে। শুধু কতগুলি মানুষকে নানা উপায়ে বাধ্য করা হচ্ছে সেখানে যেতে। অথচ নিজে সে কু-চরিত্রের লোক নয়। এমনকি ধর্মদ্বেষীও নয়। সে তার দ্বীপে মন্দির মসজিদ প্রভৃতি বানাতে দিতে চায় না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তায় হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপের ভগবান হতে চায়।[৬] কারণ মাণিক হোসেন মিয়াকে সামন্ত প্রভু মেজকর্তা অনন্ত তালুকদারের থেকে এগিয়ে দিয়েছেন। অনন্ত তালুকদারের চরিত্রটি ছোটো হলেও আলোচনার অবকাশ আছে। তবু যেটুকু দেখার মতো বিষয় তা হল মানিকের কুবের, আমিনুদ্দি, এরা হোসেনের ডি-ক্লাসড্ চেহারার টানেই হোক অথবা অর্থনৈতিক অসহায়ত্বে, সামন্ত প্রভুর সীমানা কেতুপুর থেকে বেরিয়ে নতুন অর্থনীতির ভগবান - ব্যবসায়ীর হাতে পড়েছে। আর মানিক এই ব্যবসায়ীর নয়াআবাদকে স্থাপন করেছেন রহস্য কল্পনার আর এক সীমায়, দুর্গমতায়, রহস্যে ঢাকা ময়নাদ্বীপে। এই ডিক্লাসড্ চেহারা কি হোসেনকে একেবারে সর্বময় নব্য ধনতন্ত্রবাদী ঔপনিবেশিক বলা কি যায়? অর্থনীতির সাধারণ দৃষ্টিকোণের বাইরের উত্তর—না। বরং সে এক সামন্ত প্রভু, ধনতান্ত্রিক ও ডিক্লাসড্ বুর্জোয়ার এক মিশ্রিত ব্যক্তিত্ব, আর তার কল্পনা ময়না দ্বীপ। তার ময়নাদ্বীপ যাত্রার যে দুর্গমতার বিবরণ মাণিক দিয়েছেন তাতে ময়নাদ্বীপের রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। মেঘনার মোহনায় চাঁদপুর থেকে যাত্রা করেছে 'সুমুন্দুরে'র উদ্দেশে হোসেনের নৌকা ও তার মাঝি কুবের সহ আরও সকলে। সেখান থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন মানিক দ্বীপপুঞ্জ, সিদ্ধি দ্বীপ, বিদৌ দ্বীপ, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, ধনমানিক দ্বীপ বাবনাবাদ পার হয়ে আসে ময়নাদ্বীপ। যাত্রা পথের রোমাঞ্চ ও ময়নাদ্বীপের ধর্মশাসনহীন মানুষদের মাঝে সৃষ্টির জন্য মুক্তজীবনকে স্বাধীন করে দিয়েছে হোসেনের পাড়ি।

উপন্যাসের কুবের ক্রমশ কপিলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। কপিলাও নারী চেতনায় নিজের স্বামীর অভাবকে কুবেরের মধ্যে পেতে গিয়ে অন্য কোনো স্পর্শ পেয়েছে যে চুম্বকের টানে সে উপন্যাসের শেষে উঠে বসেছে হোসেন মিয়ার নৌকায়। উপন্যাস শেষ হয়েছে আর এক যাত্রায়, যে যাত্রায় রয়েছে কুবের ও কপিলার জীবনের অনাস্বাদিত আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার আভাস। এইখানেই পদ্মানদীর মাঝি কুবেরের জীবনের নয়া বন্দর নির্ধারিত। আর সে বন্দর তার নারী কপিলা। যে একদা কুবেরের মন নিয়ে খেলতে খেলতে কুবেরের পৌরুষের জালে পড়ে গেছে। হয়তো আকুরটাকুর গ্রামের, তার স্বামী শ্যামাদাসের মধ্যে পায়নি সেই স্পর্শ, সেই দৃষ্টি, যা কুবেরের আছে তার প্রতি। কিন্তু এত আলোচনা মানিক করেননি, ময়নাদ্বীপের নৌকায় তুলে দিয়েছেন কপিলাকে।

—হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।

কথাটা Narration নয়, dialogue কিন্তু কার, হোসেন মিয়ার? নাকি লেখক উপন্যাসের শেষে ঢুকে পড়েছেন কাহিনিবৃত্তে? কোনো তাত্ত্বিক তর্কে না গিয়েও বলা যায় না কি যে লেখক এসে সরাসরি চিহ্নায়ণ করেছেন ভবিষ্যতের, ময়নাদ্বীপ নামক ভূমি ও কপিলানাম্নী নারীকে কুবেরের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে।

৩

'হলুদ নদী সবুজ বন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চৌত্রিশতম উপন্যাস, ১৩৬২ (১৯৫৬ সাল) সনের মাঘ মাসে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের গোড়ায় 'লেখকের কথা'য় মানিক লিখেছেন 'হলুদ নদী সবুজ বন' আট দশ মাস আগে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমার শরীর খারাপ, এই বইটা এত দিন আটক হয়েছিল। দোষ আমার...।' এই উপন্যাসের ঘটনা অবলম্বনে মানিক তিনটি গল্প লিখেছেন। 'বড়দিন', 'সশস্ত্র প্রহরী' এবং 'প্রাক্ শারদীয়া কাহিনী।' উপন্যাসটিতে একটি চরিত্র ঈশ্বর। যদিও সে মোটামুটি উপন্যাসের কাহিনির কেন্দ্রে থাকে তবু এই উপন্যাসের সে কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস এক ধরনের মানুষের গল্প। যেখানে মেজকর্তা অনন্ত তালুকদারের প্রবেশাধিকার নেই। অপরপক্ষে 'হলুদ নদী সবুজ বন' এক দ্বন্দ্বের উপন্যাস। বিষয়টাকে শ্রেণি দ্বন্দ্ব বলা সম্পূর্ণ ভুল হবে না। বলতে গেলে মানিকবাবু সচেতন

ভাবে কাহিনিবৃত্তে নানাপ্রকারে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনকে নিয়ে এসেছেন এবং এখানে ঈশ্বরের অবস্থান একজন শিকারি হিসাবে। যে কিনা শ্রমিকশ্রেণী কৃষক সমাজ সংবলিত নিম্নবর্গের প্রতিনিধি এবং তথাকথিত উচ্চবর্গ বা এলিটদের মধ্যে নিজস্ব সংঘাতের সূত্র ধরে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। তার মানসিকতায় শিকারি হওয়ার অনুভব। শিকারির বন্দুক চলে যায় উচ্চবর্গের আক্রোশে। ঢেউয়ের মতো ঘটনা প্রবাহ উপন্যাসে তাকে একটি কাজ থেকে অন্য কাজে নিয়ে চলে, কখনো শান সায়েবের নৌকা এবং স্টিমারে কালেক্টার, কখনো রবার্টসন সায়েবের কারখানার শ্রমিক আবার কখনো প্রভাসবাবুর বাড়ির পাহারাদার, আবার রবার্টসনের কারখানার পাহারাদার। লড়াই চলে মানুষে মানুষে এবং মানুষে বাঘে। বাঘের সঙ্গে যত বারই লড়াই হয় জয়ী হয় ঈশ্বর। এটা কিন্তু ঔপন্যাসের বিরুদ্ধে। তার শিশু সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছে শিয়ালে, স্ত্রী হয়ে যাচ্ছে উন্মাদিনীর মতো; ঈশ্বর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য নিজের কৃতিত্ব বিক্রয় করছে দুজনকে। বাঘ মারার যশ বিক্রি করে দুজনের থেকে টাকা নিচ্ছে। ঘর জ্বলেছে তার, সহকর্মীরা তুলে দিচ্ছে ঘর, এইভাবে চলতে থাকা শ্রেণি সংঘাতের উপন্যাসের শেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে অসুস্থ ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করছে তার পরিবারের লোকজন। সে যাত্রা বাঁচার যাত্রা। এখানেই উপন্যাসটি শেষ। উপন্যাসের মাঝেই উপন্যাসের শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছেন মানিক একটি ছোট্ট অধ্যায়ের। সমগ্র অধ্যায়টি এখানে দেওয়া হল–

।। চৌদ্দ।।

একবার লিখছি ঈশ্বর, গৌরী, আজিজ, শানসায়ের, ফুলজান, মন্টা, সাধুদের কাহিনী আবার আসছি প্রভাস, বনানী, ইভা, রবার্টসনদের কথায়।

ঈশ্বরের কাঁচা ঘর, লক্ষ্মণের খেয়াঘাট, উড়িয়া মালী আর অহল্যায় মিলে মিশে প্রভাসের বাগানটিকে এমন করার প্রাণপণ সাধনা যে কোনো সায়েরের বাগান তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না, ক্লাবে সন্ধ্যার দিকে নাচ, গান, হাসি, আনন্দ, তাস, বিলিয়ার্ড খেলা— বেশি রাত্রে হৈ-হুল্লোড়।

একেই কি বলে প্যারালাল মানে সমান্তরাল কাহিনী? বুদ্ধি খাটিয়ে চালাকি করে উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন অর্থাৎ চাষী মজুরদের হাজির করে ছক কাটা গল্প রচনা করা?

এতকাল সাহিত্যচর্চা করে আমার কাণ্ডজ্ঞান তাহলে নিশ্চয় লোপ পেয়েছে বলতে হবে!

শ্রেণী বিভক্ত জীবন কোনো দেশে কস্মিনকালে প্যারালাল বা সমান্তরাল ছিল না, এখনও নেই, সোনার পাথরের বাটির মতোই সেটা অসম্ভব ব্যাপার।

কথাটা ভুল বোঝা সম্ভব— আর্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করি। আমি বলছি জীবনের কথা— শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমগ্র সমাজের কথা। সমান্তরাল কাহিনী খুবই সম্ভব, একটু কায়দা করে বানিয়ে লিখলেই হলো – কিন্তু সম্পর্কহীন সমান্তরাল জীবন?

ঈশ্বর, আজিজরা থাকে এক স্তরে প্রভাস, রবার্টসনরা আরেক স্তরে। তাই বলে জীবন কি তাদের সম্পর্কহীন?

সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়?

এখানে কতগুলি কথা বলতে হবে। 'হলুদ নদী সবুজ বনে'ও —মানিক তাঁর রচনারীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে Dialogism থেকে সৃষ্ট Narration কে স্পর্শ করেছেন। লিখতে লিখতে তাঁর সামনে প্রশ্ন এসে দাঁড়াচ্ছে মার্কসীয় সাহিত্য বিচার ধারার পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে। 'ছক কাটা গল্প রচনা,' 'শ্রেণী বিভক্ত জীবন কোনো দেশে কস্মিনকালে প্যারালাল বা সমান্তরাল ছিল না, এখনও নেই,' কিংবা 'সম্পর্ক কী শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়?

এখানে কতকগুলি কথা বলতে হবে। 'হলুদ নদী সবুজ বনে'ও —মানিক তাঁর রচনারীতির অনন্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে Dialogism থেকে সৃষ্টি Narration কে স্পর্শ করেছেন। লিখতে লিখতে তাঁর সামনে প্রশ্ন এসে দাঁড়াচ্ছে মার্কসীয় সাতহিত্য বিচার ধারার পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে। 'ছক কাটা গল্প রচনা', 'শ্রেণী বিভক্ত জীবন কোনো দেশে কস্মিনকালে প্যারালাল বা সমান্তরাল ছিল না, এখনও নেই', কিংবা 'সম্পর্ক কী শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়?' প্রশ্নগুলির মধ্যে ধৃত ভাবনা নিয়ে নানা বিতর্ক একদা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন।[৮] মোট কথা 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসের সাহিত্য জিজ্ঞাসা তিনি নিজেই করেছেন, উত্তরও দিয়েছেন নিজে। সেদিক থেকে উপন্যাসটি 'পদ্মানদীর মাঝি'র মতো নয়। 'পদ্মা নদীর মাঝি'কে কুবের যত সময় গিয়েছে ক্রমশ সরল জীবন তার জটিল হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে বেরিয়ে এসেছে কোনো এক সমষ্টির থেকে, এমনকি তার পরিবার থেকেও। তার ময়নাদ্বীপে যাত্রা আসলে ব্যক্তিগত অবস্থানের বদল। যদিও নব্য ঔপনিবেশবাদ তাকে যেভাবে ক্রমশ সমষ্টি থেকে এককে পরিণত করেছে তেমনি ব্যক্তি কম নয়, একদা রাসু ও পরে আমিনুদ্দি, রসুল, এনায়েত, বিপিন, বঙ্কু প্রত্যেকে। বস্তুত সেখানেও একটি শ্রেণি তৈরি হচ্ছে যে কাহিনিটি আমাদের কাছে অনুক্ত। 'হলুদ নদী সবুজ বনে' ঔপনিবেশিক শক্তির নবরূপ অতি প্রকট রয়েছে যেখানে রবার্টসন নামক ঔপনিবেশিক ও প্রভাসবাবু নামক দেশীয় বুর্জোয়া হাত মেলায় নিজেদের স্বার্থে। আর সমান্তরালে রয়েছে ঈশ্বর ও তার সমাজ।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে এই উপন্যাসের ঘটনা নিয়ে মানিকবাবু তিনটি গল্প রচনা করেছেন। প্রথমটি 'বড় দিন' —'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসের একাদাশ অধ্যায়ের কাহিনি। যদিও গল্পের ভাষা ও উপন্যাসের ভাষা হুবহু এক নয় তবু কাহিনি বৃত্তটি ভিন্ন নয়, চরিত্রের নামগুলিও অভিন্ন। 'সশস্ত্র প্রহরী' গল্পটি অভিঘাতমূলক। উপন্যাসের ঈশ্বর এখানে হয়েছে মদন আর প্রভাস হয়েছে নাথুবাবু। উপন্যাসের নবম অধ্যায়ে প্রভাসের বাড়িতে জন্মদিনের উৎসবে মদ্যপান করে হাঙ্গামা এবং বাড়ি ফিরে আসার পর গৌরীর কোলের শিশুপত্রকে শিয়ালে টেনে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই গল্পে বিবৃত আছে। 'প্রাক্ শারদীয় কাহিনী' গল্পটি

'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসের সপ্তদশ অধ্যায়ের ঘটনাবলির একটি অংশ। এখানে উপন্যাসের গৌরী হয়েছে নব'র মা আর ঈশ্বর এখানে হয়েছে অনাথ। গল্পটির বৃত্তের সঙ্গে উপন্যাসঅংশের কোনো পার্থক্য নেই। শুধু গল্পের শেষে লেখক কর্তৃক দেওয়া একটা বিরল উপসংহার আছে 'গল্প লেখার চিরন্তন আইন এবং নিয়মকানুন ভঙ্গ করে'[৯] তাতে আছে—

> নব'র মা এবং পিসী ওই বন্যাতেই অক্কা পেয়েছে। জ্বরে অজ্ঞান অনাথ, ছেলেমানুষ নব এবং বাচ্চা মেয়েটাও যে মরে গেছে বলাই বাহুল্য। সুতরাং এটাযে বানানো গল্প নয় প্রমাণ করার জন্য জ্যান্ত সাক্ষী খাড়া করতে পারব কিনা ভাবছি।

গল্পের শেষে মানিক একটা উপসংহার কেন দিলেন বোঝা গেল না। গল্পের শেষে এই কথাগুলিতে যে পরিণাম নির্দেশ করা হয়েছে উপন্যাসে সেই রকম পরিণাম হয়নি বলাই বাহুল্য। গল্পে বাঁচার চেষ্টায় শেষ দৃশ্যে মগ্ন অনাথ তথা ঈশ্বরের পিসি ও কুনো তথা নব'র মা। 'হলুদ নদী সবুজ বনে'র কাহিনির শেষটিতে আরও কয়েকটি মাত্র আছে। বলা ভালো এই গল্পের প্লটটি উপন্যাসের একেবারে অন্তিম অংশ। এখানে আরও একটি চরিত্র আছে, সমগ্র উপন্যাসের প্রেক্ষিতে অনন্য মাত্রার চরিত্র, 'লখা'র মা'। উপন্যাসবৃত্তে বাঁচার চেষ্টায় বলা ভালো বন্যাবিধ্বস্ত ঈশ্বরের পরিবারকে বাঁচানোর চেষ্টায় রত লখার মা, ঈশ্বরকে বাঁচানোর চেষ্টায় রত। যে কিনা এক দিকে ঈশ্বরের গুণমুগ্ধ ও অন্যদিকে সংগ্রামের সাথি। উপন্যাসের শেষ পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারিত গল্পের শেষ বাক্য 'পায়ের নীচে মাটি তো সরে যায়নি' এর পরে—

> 'আয় সবাই মিলে ধরাধরি করে মানুষটাকে নৌকায় নামিয়ে আমি। মানুষের আশ্রয় মিলবেই, বন্যা হোক আর ভুমিকম্প হোক।'

এই সদর্থক ভাবনা আসলে উপন্যাসোক্ত শ্রেণী সংগ্রামেরই প্রতিধ্বনি। গল্পে আর উপন্যাসে এখানেই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য। উপন্যাসের শেষের এই যাত্রা যতই অনির্দিষ্ট হোক না কেন তার যে সংগ্রামের পথে লঙমার্চ।

৪

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস মাছমারা জেলেদের জীবনাশ্রিত আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রকরণে সীমাবদ্ধ নয়। এই উপন্যাসের আসল ব্যঞ্জনা হিসাবে হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপের কথা আগেই বলা হয়েছে। 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসের কাহিনি সরাসরি শ্রেণি সংঘাতের। একথা লেখক নিজেই বলেছেন। কিন্তু 'পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের মতো 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসে একটা বিষয় আছে তা 'ময়নাদল'। 'পদ্মাপনদীর মাঝি উপন্যাসের ময়নাদ্বীপের ধারণা থেকে যা আলাদা, কিন্তু অন্য মাত্রার অনন্যদৃশ্য এই ময়নাদল। ময়নাদ্বীপের সঙ্গে যেমন হোসেন মিয়া জড়িয়ে আছে তেমনি ময়নাদলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লখার মা। প্রবন্ধের শুরুতে এই কারণেই এগিত থেকে তুলনা টানা হয়েছে। ময়নাদ্বীরের নব্য ঔপনিবেশিক যে ব্যাখ্যাই থাক-না-কেন এনায়েতের দ্বিতীয় স্ত্রী প্রাপ্তি এবং কুবেরের কপিলা - সঙ্গ হয়ে ময়নাদ্বীপে গমনের মধ্যে ময়নাদ্বীপের যে ব্যঞ্জনা পরিস্কৃত, তা হল ময়নাদ্বীপ The Land of Desire. উপন্যাসে যা নিম্নবর্গের জনসমাজের মধ্যে অবস্থান করেছে অন্যতর এক পাড়ি হিসাবে। যেখানে বন্ধন একমাত্র হোসেন মিয়া, যার উপস্থিতি সমগ্র পরিস্থিতিকেই উত্তর ঔপনিবেশিক করে তোলে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে ওই ময়নাদ্বীপ পরিণত হয় সব হারিয়ে আসা মানুষগুলির এক নব্যতর পৃথিবীতে, নতুন মহাদেশে। ময়নাদল কিন্তু তা নয়। ময়নাদ্বীপ যে কতটা অর্থে সৃষ্টির নতুন পৃথিবী তা ময়নাদলের প্রেক্ষিতে ভালো বোঝা যায়। ময়নাদল 'হলুদ নদী সবুজ বনে' ময়নাদ্বীপের মতো সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি কিন্তু তার অবস্থিতি আছে। ময়নাদলের কথায় লখা'র মা'র চরিত্রটি আলোচনা সাপেক্ষ। লখার মা এখানে আরও একটি মাত্র, যেখানে শ্রেণিসংগ্রামী ঈশ্বর আর ঔপনিবেশিকতার শিকার কুবের আলাদা। কুবেরকে যৌন মনস্তত্ত্ব জ্বালায়, কপিলার রূপও জ্বালায়। কিন্তু লখা'র মা'য়ের প্রত্যক্ষ আহ্বান সত্ত্বেও ঈশ্বর প্রত্যাখান করে চলে। পুতুল নাচের ইতিকথা কিংবা চতুষ্কোণে, শশীডাক্তার অথবা রাজকুমারের মনস্তত্ত্বে যৌনতা এক এক বিচিত্র ধারায় এসেছে। একথা বলার কারণ শশী, কুবের বা রাজকুমারের পরে হলুদ নদী'র নায়ক ঈশ্বরের লখার মাকে প্রত্যাখ্যান এদের থেকে তাকে আলাদা করেছে। লখার মা সাধারণভাবে একজন বিধবা, কথকতা করে তার সংসার চলে। গৌরীর অসুস্থতার সময় ঈশ্বরের বাড়িতে এসে কথকতার সময়েই সে ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষিত হয়, লখার মা'র আবির্ভাব আখ্যায়িত আছে—

> 'লখার মা মাঝ বয়সী। যৌবনে নিশ্চয় ভাটা শুরু হবে দু-চার বছরের মধ্যেই। গায়ের রঙ চোখ - জুড়ানো স্নিগ্ধরকম কালো।'

আর তার গল্প বানাবার ক্ষমতা অসাধারণ 'অদ্ভুত উদ্ভট কাহিনী' বলে চলে সে। লখার মা মুক্ত মনে মশকরা চালায় ঈশ্বরের সঙ্গে, বলে—

> 'তোমার' পরে এমনভাবে বিগড়ে গেছে মনটা? ভাবছি কি জানো? চোখের সামনে মোরা যদি পিরিত চালাই, এমনিভাবে তাকিয়ে দেখবে, গ্রাহ্যির মধ্যে আনবে না।'

এমনই মুক্ত সে। সমগ্র উপন্যাসের শ্রেণিসংগ্রাম উপন্যাসের শেষে 'ষোলো' তম অধ্যায়ে গিয়ে এক অনন্যতা লাভ করেছে ময়নাদলের বর্ণনায়। 'সপ্তম' অধ্যায়ে ময়নাদলের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়—

> ওপারে তো গহন বন।
>
> প্রায় দু'মাইল পূর্বে বনের সীমার গা ঘেঁষে ময়নাদল। বনের এদিকের সীমা নদী থেকে শুরু হয়ে খানিকটা এগিয়ে পিছিয়ে এঁকে বেঁকে, কোথাও ঘন কোথাও বিরল হয়ে মোটামুটি পূব দিকে এগিয়ে এগিয়ে বাঁক নিতে নিতে ক্রোশ দুই ভিতরে ঘেঁষে হঠাৎ যেন দমক মেরে উত্তর দিক্ পরিবর্তন করেছে।
>
> বাঁশবন শাল কুঁদিয়াকে পাক দিয়ে ময়না দলে বড় হাট বসে— হপ্তায় দু'দিন।

শানসায়েবের নৌকার আর লঞ্চের খেয়াঘাটে তদারকির কাজ করেছে ঈশ্বর অসময়ে। একদিন শাসনসায়েবের বাড়ির চাকরানি ফুলজান গৌরীকে এসে জানায় যে শানসায়েবের স্ত্রীর আমিনাবিবি একবার ডেকে পাঠিয়েছে ঈশ্বরকে। আমিনাবিবি পর্দানশিন রমণী, ঈশ্বর যায় তার কাছে। আমিনাবিবি জানায় মেয়ে নুরুল বন দেখতে যেতে চায়। অনেক দূরের বড়ো এক শহরের একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা চলছে। তাই বন দেখতে চায়। যদিও বনে সে একলা যাবে না, ফুলজান যাবে, লখার মা যাবে, রোস্তম যাবে, আর বড়োমিঞা অর্থাৎ বাঘেদের ঠেকাবে ঈশ্বরাগে সে ভালো শিকারি, এই স্বীকৃতি সে পেয়েছে ক্লাবের মেম ও বিবিদের কাছে। এখন সাধারণ ঘরের বউ - ঝি রাও তাকে সেই চোখেই দেখে। সে আনন্দিত হয়, রাজি হয়। নৌকোয় করে নদী পার হয়ে তারা যায় ময়নাদলে, বনের শুরু যেখানে, সেখানে। বনের আশ্চর্যে চোখে ধাঁধা লাগে অভিযাত্রীদের। ঈশ্বরের বনজ অভিজ্ঞতার বর্ণনায়—

'কোথা থেকে আজিজ এসে দলে ভিড়ে পড়লে ঈশ্বর তাজ্জব বনে যায়!
বনের মধ্যে তখন তার বেশ খানিকটা এগিয়েছে।
ফুলজান হাসে, লাখ মা হাসে, রোস্তম হাসে— মাথা আরও গুলিয়ে যায় ঈশ্বরের।
ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করে, হেথা কি করছিলে তুমি?
আজিজ জবাব দেয়, কি করবো? বিড়ি ফুঁকছিলাম।
তখন লখার মা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে, এগুলোকে কি বলে ঈশ্বর?
ঈশ্বরও গম্ভীর হয়ে বলে, এগুলো শুলো।
এগুলোর জন্যই বনে ঢুকতে তাদের অসুবিধা হচ্ছিল।
কাঁটায় ভরা সরু গাছ। সমস্ত বন জুড়ে মাথাটা সুঁচালো।
এই কাঁটাওলা শুলো গাছের জন্য বনে চলাফেরা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।
বড় গাছ উদারভাবে পথ দেয়।
শুলো গাছ ছিঁচকের মতো পথ আটকায়।
নুরুল আর আজিজ এবং রোস্তম আর ফুলজান কোথায় যে উধাও হয়ে যায় বনের মধ্যে!
ঈশ্বর ভাবে, বাঘ ভালুক ওদের জখম করলে দোষ হবে তার।
লখার মা বলে, গিয়েছে, যাক! আমরাও একটু পিরিত করি এসো না। তুমি বড় নীরস মানুষ।
ঈশ্বর বলে, এটাই তবে ওদের আসল মতলব ছিল?
লখার মা বলে, ছিলই তো। তুমি আছো, আমি আছি—দোষ কি?
ঈশ্বর বলে, দশজনে দুষবে সেই জন্যই দোষ— নইলে আর দোষ কি?

তারপরেই ঘটে যায় একটা ঘটনা, ঈশ্বরের বন্দুক গর্জন করে ওঠে। মারা যায় একটি ছোটো বাঘ। তারপর পরিবেশটা বদল হয়ে যায়। বনের ভেতর থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে আসে। ঈশ্বরের শিকারি পরিচিতি তো স্বীকৃতই। লখার মা'র 'পিরিত' করার প্রস্তাব ঈশ্বরের দ্বারা স্বীকৃতও হয়নি আর সেটা কারও যায়নি। ঈশ্বর আসলে তার শিকারি পরিচিতির জন্য যতটা বিহ্বল, লখার মা'র সঙ্গে 'পিরিত' করতে সে ততটা নয়। ময়নাদলের একটা দৃশ্যে এই রকম একটা রোমান্স তৈরি হয়েছে এবং ঈশ্বরের গুলির শব্দে যে রোমান্স বা নিষিদ্ধ প্রেম ও তার পরিবেশ ছত্রখান হয়ে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ময়নাদল তার রোমান্টিক চরিত্রে বরং সেই Land of desire এর বাতাবরণটায় চলে এসেছে। ঠিক যে ইঙ্গিত ময়নাদ্বীপেও ছিল। ময়নাদ্বীপ ও ময়নাদল নাম দুটির সাম্যও কি সেই কারণে? ময়না শব্দটি সংস্কৃত মদনা (পাখি) থেকে এসেছে।[৯] সংস্কৃত পক্ষীনাম মদনসারিকা বা মদনার উৎস প্রাকৃত বা ঔপভাষিক ময়না কিনা কিংবা সংস্কৃত পক্ষীনাম মদনসারিকা বা মদনার উৎস প্রাকৃত বা ঔপভাষিক ময়না কিনা কিংবা সংস্কৃত শব্দটির উৎস হিসাবে মদন শব্দের সত্যই যোগসূত্র আছে কিনা তা অন্য কোনো বিতর্কের বিষয়। কিন্তু দুটি ময়না নাম সংযুক্ত স্থলই যে মনের আন্তর বিকাশের স্থল - মদনভূমি বা Land of desire এ বিষয়ে সংশয় থাকে না। মানিক সচেতন ভাবেই ময়নাদ্বীপ ও ময়নাদলকে গড়েছেন সন্দেহ নেই। একটি উপন্যাসের নব্যঔপনিবেশিকতাবাদী পটভূমিতে মুক্ত ভূমিখণ্ড হয়তো ময়নাদ্বীপ আর শ্রেণি সংগ্রামের মাঝে বন্ধন মুক্তির স্থল আর একটি উপন্যাসে হল ময়নাদল। দুটি উপন্যাস একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিন্তু মানুষের মুক্ত জীবনের প্রতীক ওই ময়নাদ্বীপ ও ময়নাদল উভয় উপন্যাসের মধ্যে সেতু রচনা করেছে আর সমস্ত শ্রেণিবিভক্ত মানুষকে একদিকে জীবনসংগ্রামে, আর অন্যদিকে মনের মুক্তির অবকাশ দিয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি ও 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাস দুটি এবং এদের মধ্যেকার ময়নাদ্বীপ ও ময়নাদল। এখানে দ্বীপ অবশ্যই স্বাতন্ত্র্য বা এককতার প্রতীক যা পদ্মানদীর মাঝির লেখকের ভাবনালব্ধ ফল আর দল শব্দটিতেই সমষ্টির প্রতীক রয়েছে। কুবেরের পরিণতি থেকে ঈশ্বরের পরিণতি, দুই ছিন্ন মূলের পরিণতি, দুই ছিন্ন মূলের পরিণতির পার্থক্যই 'হলুদ নদী সবুজ বনে'র মানিকভাবনাকে প্রকাশ করেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। গ্রন্থপঞ্জি ঃ পৃষ্ঠা ১৬১, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডানঅ বুক এজেন্সি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'নীল কণ্ঠ' - ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত ; বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ১৯২৯ শে প্রকাশিত মানিকবাবুর প্রথম উপন্যাস প্রকাশ পায় 'জজনী' ১৯৩৫-এ।
৩। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি, এই গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে (পৃ. ৫১৩)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনার শিরোনাম' জীবন সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ।'
৪। ড. অভিজিৎ মজুমদার, শৈলী বিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, ১৪৮ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ক আলোচনা রয়েছে।
৫। মালিনী ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সি পৃষ্ঠা ৫১৭
৭। লেখকের কথা : পৃষ্ঠা ১১৩ - ১৪, নিউ এ'জ পাবলিশার্স;
৮। সংকলিত গল্পের গল্প '-প্রাক্ শারদীয় কাহিনী', মানিক গ্রন্থাবলী দ্বাদশ খণ্ড, ৩৩৯ পৃষ্ঠা বন্দনীর মদ্যেকার কথাগুলি ওই বইটিতে সম্পাদকীয় উক্তি।
৯। A comparative dictionary of Indo - Arian Languages. R. L. Turner, Oxford University Press, London, এবং বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য একাডেমী, দ্বিতীয় খণ্ড।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ
১। মানিক গ্রন্থাবলী - মম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ খণ্ড গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড।
২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি।
৩। সাহিত্য বিচার ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ - ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং।
৪। শৈলী বিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব— ড. অভিজিৎ মজুমদার, দে'জ পাবলিশিং
৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—মালিনী ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি।
৬। বাখতিন্—তপোধীর ভট্টাচার্য্য, অনুষ্টুপ প্রকাশনী।
৭। A comparatove Dictionary of Indo - Arian Languages. R. L. Turner. Oxford University Press. London.
৮। বঙ্গীয় শব্দ কোষ— হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য একাডেমী, ২য় খণ্ড।
* বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার অনেক সূত্রই অধ্যাপক আবদুল কাফির সঙ্গে আলোচনায় প্রাপ্ত।